পশ্চিমবঙ্গ উন্নয়নের পথে কি ঘুরে দাঁড়াচ্ছে?

সুবীর দত্ত রায়

যে প্রদেশ স্বাধীনতা প্রাপ্তির লগ্নে সর্বভারতীয় স্তরে প্রথম বা দ্বিতীয় স্থানে অভিষিক্ত ছিল সেই পশ্চিমবঙ্গ পরবর্তী চার পাঁচ দশকের মধ্যেই কী করে এক অনুন্নত প্রদেশে পরিণত হয়ে গেল সে এক বেদনাদায়ক ইতিহাস। ২০০২ সালের 'উন্মুক্ত উচ্ছ্বাস' পত্রিকায় একটি প্রদিবেদেন লেখক FICCI নির্দেশিত এবং অর্থনীতিবিদ শ্রী বিবেক দেবরায় পরিচালিত একটি সমীক্ষার সারাংশ পেশ করেছিলেন। পাঁচটি মাপকাঠির বিচারে দেশের বিভিন্ন প্রদেশগুলি পুঁজিনিবেশের ক্ষেত্র হিসেবে কতটা আকর্ষণীয় বা নির্ভরযোগ্য, এই বিচার করা হয়েছিল। ১৮টি বড় প্রদেশের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের স্থান ছিল ১৫ নম্বরে অর্থাৎ অত্যন্ত নিম্ন পর্যায়ে। সে সমীক্ষায় আরও হতাশাব্যঞ্জক কিছু তথ্য পেশ করা হয়েছিল। যেমন, গ্রামে ইলেকট্রিক সাপ্লাই - এর ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের স্থান ছিল নীচের ১৬ নম্বরে, লোকসংখ্যার অনুপাতে হাসপাতালেরসংখ্যার বিচারে ১৫ নম্বরে অর্থাৎ অত্যন্ত নিম্ন পর্যায়ে । খাজনা আদায় ও পরিশোধের ঘাটতির বিচারে ১৬ নম্বর স্থানে ইত্যাদি। সেই সময়কার আরও কিছু পরিসংখ্যান থেকে জানা গিয়েছিল যে পশ্চিমবঙ্গ গ্ন ছোট শিল্পের গণনায় ছিল প্রথম স্থানে, স্ট্রাইক ও লকআউটের রেকর্ডে শীর্ষস্থানে এবং রেজিস্টারড বেকারিত্বের সংখ্যায় দ্বিতীয় স্থানে। সর্বভারতীয় আর্থ - সামাজিক উন্নতির এই তুলনামূলক বিচারে পশ্চিমবঙ্গকে একটি মুমূর্ষু দেশ বলে মনে হচ্ছিল। এই অবস্থার পুনর্বিচারের কোনও প্রয়োজন আছে কি? লেখকেরা নিবেদন, হ্যাঁ আছে। ওই প্রদেশ গত দশ পনেরো বছরে ক্রমশ হৃতস্বাস্থ্য পুনদ্ধারের দিকে এগে াচ্ছে। সেই জাগরণের ইঙ্গিতবাহী কিছু উদাহরণ পরিবেশন করা যেতে পারে।

এমনিতে আটের দশকের মাঝামাঝি থেকেই কলকাতা ও শহরতলী অঞ্চলে পরিবর্তনের আভাস পাওয়া যাচ্ছিল, যেটা নয়ের দশকে এসে দৃশ্যমান হল। পথঘাট তৈরী হল। অনেক পাড়ায় বহুতল বাড়ি তৈরী হতে থাকল, শপিং সেন্টার, কমার্শিয়াল কমপ্লেক্স কিছু কিছু মাথা গজাতে শু করল, সায়ন্সসিটি সাকার হল। দু'চারটে উড়ান পুলও দেখতে পাওয়া গেল। এরই সাথে পত্রপত্রিকায় প্রকাশ হতে থাকল সল্ট লেকের থেকেও তিনগুণ বড়ো মাপের উপনগরীর প্ল্যান, যেটা সাড়ে তিন হাজ ার একরের ওপর তৈরী হচ্ছে। বানতলায় ১১০০ একর জমির ওপর দৈরী হচ্ছে চর্মনগরী, বারাসত - রায়চকের মধ্যে এক্সপ্রেসওয়ে তৈরীর কাজে ১০০০ একর জমি গ্রহণ করা হয়েছে। ইন্দোনেশিয়াস্থিত বিখ্যাত বাঙালি ব্যবসায়ী শ্রী প্রসুন মুখোপাধ্যায় এ প্রদেশে ৩০০ কোটি টাকা বিনিয়োগের প্ল্যান ঘোষণা করে গেলেন। এমনি সব প্রকল্পের মধ্যে একটা জাগরণের সাড়া পাওয়া গেল। এবারে এই প্রচেষ্টাগুলির মধ্যে মাত্র চার - পাঁচটি ক্ষেত্রকে একটু সবিস্তারে বর্ণনা করা যাক কারণ ত ার ভেতর পরিবর্তনের আরও গভীর ব্যঞ্জনাবাহী উদাহরণ পাওয়া যাবে।

(১) হলদিয়া প্রেট্রোকেমিক্যাল প্রকল্প। ১৯৯৪ সালে বিখ্যাত উদ্যোগপতি শ্রী পুর্ণেন্দু চ্যাটার্জী (TCG কোম্পানী)ক যোগদানের পর, এর কাজ ত্বরান্বিত হয়েছে। ১৯৯৭ সালে প্রজেক্ট শু হয়, ঘাড়ে ঋণের বোঝা ক্রমশ নামিয়ে দিয়ে এটি এখন লাভদায়ক ব্যবস্থা বলে গণ্য হতে চলেছে। পূর্ণেন্দুবাবুর নিয়মিত অর্থে এটিতে তাঁর শেয়ার দাঁড়িয়েছে প্রায় ৬০ ভাগ (৩৬.৯ শতাংশ)। ইতিমধ্যে পূর্ণেন্দুবাবু আর একটি (পুঁজি নিয়োগের) রেকর্ড স্থাপন করেছেন বিশ্বের বাজারে। নেদারল্যান্ডে ব াসেল নামধারী পৃথিবীর বৃহত্তম প্লাস্টিক শিল্পের গবেষণা ও উৎপাদন কেন্দ্রকে কিনে নিয়েছেন। এদের কাছে এই প্লাস্টিক শিল্পের অজস্র পেটেন্ট রক্ষিত আছে। যদি হলদিয়া পেট্রোকেমিক্যাল সংস্থা কাঁচামাল জোগাতে পারে এবং যদি বাসেল কোম্পানী সেগুলিকে উৎপাদনের ক্ষেত্রে লাগাতে পারে, তাহলে এই দুই শিল্পমাধ্যমের মেলবন্ধনে এক অভূতপূর্ব ব্যবসায়ের দ্বার উন্মুক্ত হয়ে যেতে পারে। এখন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সঙ্গে পরামর্শ করে তাঁদের শেয়ার সম্বন্ধেকী পরিকল্পনা ফাঁদছেন ত ারই ওপর এর ভবিষ্যৎ নির্ভর করবে।

(২) পূর্ণেন্দুবাবুর পরিচালনাধীন আরও তিনটি প্রকল্পের কাজ চলছে পশ্চিমবঙ্গে। একটি হচ্ছে 'কেমবায়োটিক' মৌলিক ওষুধের molecule আবিষ্কারের গবেষণাকেন্দ্র। অন্য একটি সংস্থার 'সিলিকোজেন' কাজ করছে ওষুধ নির্মাণের প্রক্রিয়াগত ও প্রযুক্তিতপরিবর্তনে কী করে মূল্য সংকোচন করে আনা যায়, তার জন্য গবেষণা। এই দুটি সংস্থার কাজকর্ম ভবিষ্যতের ফার্মাসিউটিক্যাল ও কেমিক্যাল ইন্ডাষ্ট্রির ওপর সারা দেশে প্রভাব ফেলবে। তৃতীয় সংস্থাটি সফটওয়ার কোম্প ানী, আমেরিকান কোম্পানী ইউনাইটেড এয়ার লাইনসের কাজ করে।

(৩) ইনফরমেশান টেকনোলজির বিশাল উপস্থিতি ঃ- পনেরো বছর আগে I.B.M -কে বিতাড়নের ফলে এবং কম্পিউটার জগৎ থেকে দীর্ঘদিন নির্বাসনের পরে এতদিনে বঙ্গভূমিতে I.T. শিল্পোমাধ্যমকে তার যোগ্যভূমিতে প্রতিষ্ঠা করা গেছে। WIPRO কোম্পানীর শিল্পোদ্যোগ এই পরিবর্তনের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এখনই বিশেষজ্ঞরা বলেছেন ব্যাঙ্গালোর এবং হায়দ্রাবাদের পর কলকাতাই হবে I.T ইন্ডাষ্ট্রির তৃতীয় স্থানে। মুকেশ আম্বানি একটা I.T. Training Institute খুলবেন এমন প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। একাট I.T. Research Center -ও খোলা হবে ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিক্যাল ইনস্টিটিউটের তত্ত্বাবধানে। এই প্রসঙ্গে এট াও লক্ষনীয় যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ক্রমশ দীর্ঘমেয়াদী উন্নতির ধারাকে সংরক্ষণের জন্য ইতিমধ্যেই ২৫০০ স্কুলে কমপিউটার শিক্ষা শু করে দিয়েছেন। কারিগরী শিক্ষার জন্য নানা সংস্থাকে প্রোৎসাহিত করেছেন। পশ্চিমবঙ্গ জেলা সদর দপ্তরগুলি ওয়েস্টবেঙ্গল স্টেটওয়াইড এরিয়া নেটওয়ার্কের দ্বারা যুক্তহয়ে গেছে। কলকাত ার ম্যানেজমেন্ট স্কুলগুলিও গুণগত বিচারে সর্বভারতীয় স্তরে প্রথম দশটির মধ্যে স্থান করে নিয়েছে। কাজেই প্রশাসনে এর একটা শুভ প্রতিফল আসবে এমন আশা করা অসঙ্গত নয়।

(৪) নগরায়ণ শিল্পনগরী ও উপনগরী সৃষ্টি প্রকল্প ঃ- কল্যাণী এবং সল্টলেকের সৃষ্টি সেই ধীরগতি এবং আংশিকভাবে রূপায়িত পরিকল্পনাগুলির অস্বস্তিকর স্মৃতি ছা

পিয়ে এবারে আসছে বিশালকায় উপনগরী স্থাপনের তোড়জোড়। দক্ষিণ ২৪ পরগণাতে ৫১০০ একরব্যাপী জমির ওপর প্রায় ৪৪ হাজার কোটি টাকার বিনিয়োগে তৈরী হবে এক উপনগরী। কাজ শেষ হবে ১৫ বছরে এবং এতে ১৫ হাজার লোকের কর্মসংস্থান হবে বলে আশা। এটি রূপায়ণের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে ইন্দোনেশিয়ার সালিম নির্মাণ সংস্থাকে যেটি সৃষ্টি করেছিল ইন্দোনেশিয়ার ধিক্কৃত এবং অপসারিত প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট সুহার্তো। নানা উত্থানপতন পেরিয়ে তারা কমিউনিস্ট চীন দেশের বিখ্যাত নির্মাণ সংস্থা কসকোর ৪৫ শতাংশের পার্টনার এবং চীনের বিভিন্ন প্রকল্পে ১.২ মিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করেছে। সাংহাই ও তাইওয়ানের চমকপ্রদ অট্টালিকা, হোটেল, ট্রেড প্লাজা, ডেয়ারী ফার্ম ইত্যাদিতে এদের কাজ চলছে।

হুগলীর ডানকুনিতেও একটি উপনগরী তৈরীর প্রাথমিক পরিকল্পনাও তৈরী হচ্ছে। উত্তর ২৪ পরগণা অঞ্চলে একটি উপনগরী তৈরীর জন্য অনেক সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছে এবং অষ্ট্রেলিয়ার একটি নির্মাণ সংস্থার সঙ্গে বোঝাপড়া অনেক দূর এগিয়েছে বলে শোনা যাচ্ছে। এই পরিকল্পনার সঙ্গেই জড়িত থাকবে একটি মোটর সাইকেল তৈরীর কারখানা, একটি দ্রুতগতি পথ (এক্সপ্রেসওয়ে) এবং বিভিন্ন রোগনির্ণয় ও রোগচিকিৎসার জন্য নানা বিশেষ ধরনের হসপিটাল সমাবেশে একটি হেলথ সিটি। অন্য একটি ইন্দোনেশিয়ান কোম্পানী Paper pulp তৈরীর কারখানা খুলবার কাজে রত। জাপানী কোম্পানী মিটসুবিশি হলদিয়াতে দ্বিতীয় কারখানা স্থাপনে এখন ব্যস্ত। রাশিয়ান মোটরবাইক কোম্পানী উরালও বছর নভেম্বর মাস থেকেই বড় ট্রাক তৈরী করে বাজারে ছাড়বেন এমন আশা করা যাচ্ছে।

উপনগরী তৈরীর প্রসঙ্গে সবচেয়ে উল্লেখনীয় ঘটনা হচ্ছে সল্টলেকের উপকণ্ঠে ৩০৭৫ একর জমির ওপর তৈরী হচ্ছে AXIS নিউটাউন। এটি সল্টলেক সিটি থেকে ৭ গুণ বড়ো হবে এবং এয়ারপোর্টের সঙ্গে এক্সপ্রেসওয়েতে যোগাযোগ থাকবে। ২০০৮ সালের মধ্যেই এটির নির্মাণ কাজ শেষ হবে। এর সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে যুক্ত রয়েছে বেঙ্গল পিয়ারলেস হাউসিং ডেভেলপমেন্ট কোম্পানী, যাঁরা ২৫০ কোটি টাকা নিয়োজন করেছেন পূর্বভারতের বৃহত্তম শপিং এবং এন্টারটেনমেন্ট মল - এর জন্য। এঁদের সাথেই নির্মাণ কাজে জড়িতে আছে অষ্ট্রেলিয়ার CEBIT (ইন্টারন্যাশনাল) কোম্পানী। বলা হচ্ছে এটাই হবে I.T. Industry -র বৃহত্তম প্রাণকেন্দ্র যাতে তিন লক্ষেরও অধিক I.T. কুশলী কর্মীরা কাজ করবেন। এঁদের আবাস - স্থানও অনেকটা এই Axis Complex -এর ভেতরেই থাকবে।

(৫) আন্তর্জাতিক মনের দ্বিতীয় Airport নির্মাণ ঃ- সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রী শ্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য সিঙ্গাপুরের সফরে প্রধানমন্ত্রী Lee Hisien কে এই প্রকল্পে শতকরা ১০০ ভাগ বিদেশী পুঁজি বিনিয়োগের (F.D.I.) আশ্বাস দিয়েছেন। অবশ্য এ ব্যাপারেও সি.পি.এম-এর পলিটব্যুরো এবং সেন্ট্রাল কমিটিতে কিছু আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে। অন্যদিকে বুদ্ধদেববাবুর নানা সাহসী পদক্ষেপে দেশের প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিজী এমনই প্রসন্ন যে তিনি পার্লামেন্টে দাঁড়িয়েই বলেছেন দেশের অন্য মুখ্যমন্ত্রীদের বুদ্ধদেববাবুর পদাঙ্ক অনুসরণ করা উচিত।

বুদ্ধদেববাবুর সামনে আছে তিন বছর মেয়াদী World Bank -এর তিন বিলিয়ন ডলার (১৩,২০০ কোটি টাকার) লোনের প্রতিশ্রুতি। তিনি পশ্চিমবঙ্গের এই উন্নয়নের পথে পদক্ষেপগুলিকে শুধু প্রাদেশিক ঘটনা বলে দেখছেন না। তিনি বিশ্বাস করেন এই বঙ্গভূমিই একদিন ASEAN ব্যবসায় গোষ্ঠীর সিংহদ্বার হবে এবং তার জন্য ব্যাপক পরিকল্পনা ও পরিযোজনা অবশ্যম্ভাবী। এবং এর ভেতরেই নিহিত আছে ব্যাপক কর্ম সংস্থানের সম্ভাবনা। তিনি খোলাখুলি বলেছেন, ফান্ডে টাকা নেই। অতএব বিদেশী পুঁজি স্বাগত। এই স্বাগত জানানোর ফলেই চীনের আজ এত বাড়বাড়ন্ত অবস্থা। সেখানে নিয়োজিত F.D. এর পরিমাণ ভারতবর্ষ থেকে দশগুনেরও বেশি। তবে অন্য বামপন্থী সহযাত্রীরা বলেছেন, চীনে আর্থিক উন্নতির (G.D.P.8-9%) যে লাগাতার উর্ধগতি অব্যাহত রাখা সম্ভব হয়েছে, আমাদের দেশে সেটা হয়তো সেই মাপে চালিয়ে যাওয়া সম্ভব নাও হতে পারে।

ওপরের মাত্র কয়েকটি উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উদাহরণ ছাড়াও পশ্চিমবঙ্গের ক্রমিক উন্নতির কিছু লক্ষণ অন্য এক সমীক্ষাতেওপ্রকাশ পেয়েছে। স্ত্রী বিবেক দেব রায় এবং স্ত্রী লাভিশ ভান্ডারী ইন্ডিয়া টু ডে আয়োজিত এক সর্বভারতীয় সমীক্ষায় (১৫.৮.২০০৫) দেখিয়েছেন যে দেশের ২০টি বৃহৎ প্রদেশের সার্বিক উন্নতির মান অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গ ২০০৪ সালে ১৪ নম্বর স্থান থেকে ২০০৫ -এর মধ্যেই ১৩ নম্বরে উন্নতি হয়েছে। স্বাস্থ্য, জলসরবরাহ ও স্যানিটরি - এর ক্ষেত্রে বার্ষিক বাজেটের সবচেয়ে বেশি খরচ করেছে অন্য প্রদেশের তুলনায়। যদিও তার ফলাফল এখনও আসানুরূপভাবে প্রকট হয়নি। গরিবিয়ানার সীমারেখার নীচে রয়ে যাওয়া মানুষদের গণনায় ১৯৮৮-১৯৯৯ সালের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে ৭ নম্বর স্থানে পৌঁছে গেছে। প্রাথমিক শিক্ষার প্রসারের ব্যাপারে সাধারণ বাঙালিদের দীর্ঘদিনের লালিত ধারণাকে নস্যাৎ করে দিয়ে দেখা যাচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ এখনও ১৮ প্রদেশের মধ্যে ১৪ নম্বর স্থানেই রয়ে গেছে। কৃষিক্ষেত্রে অবশ্যই উন্নত অবস্থা, অষ্টম স্থানে পৌঁছেছে (২০০৪-২০০৫)। কিন্তু পুঁজি নিয়োগের উপযোগিতার বিচারে (যার ভেতরঅবশ্য অনেক অর্থনৈতিক, আইনী, শ্রমনীতি - করণীতি, পরিকাঠামো শিক্ষা, স্বাস্থ এবং আইন শৃঙ্খলা জাতীয় প্রশ্ন জড়িত আছে) পশ্চিমবঙ্গ এখন যে তিমিরে ছিল সে তিমিরেই আছে, ১৮ নম্বর স্থানে। তবে গত দেড় দশকের উন্নতির গতি দেখে মনে হয় এর দ্রুত পরিবর্তন আসবে আগামী এক দশকেই।

প্রতিবেদনের এই পর্যায়ে এসে কয়েকটি বুনিয়াদী প্রশ্ন তোলা দরকার। এ প্রসঙ্গগুলি খুবই জটিল এবং বিশেষজ্ঞদের বিচরণক্ষেত্র। কিন্তু সাধারণ নাগরিকদেরও কিছু তথ্য জানা দরকার। নীতিগত প্রশ্নে সরকারী বেসরকারী মহলে কেন এত দ্বিধা দ্বন্দ্ব দেখা যায় সেই বিষয়গুলি বোঝা তাতে কিছুটা সহজ হয় এবং আমাদের সমালোচনাগুলিও অসহিষ্ণু বা অযৌক্তিক হয়ে পড়ে না। মাত্র তিনটি উদাহরণের মাধ্যমে মতবিরোধের বড় বড় ক্ষেত্রগুলির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা করার প্রয়াস করা হচ্ছে।

(১) Disinvestment (বিলগ্নীকরণ) ও Privatization (বেসরকারীকরণ) -- অকেজো বা ক্ষতির ভারে মগ্ন শিল্প সংস্থাগুলি নিয়ে সরকারী মহল বড়ই চিন্তিত ও বিব্রত। বার্ষিক ক্ষতির পরিমাণপ্রায় ৩৫ - কোটি টাকা এবং এতে নিযুক্ত আছে প্রায় ৮০,০০০ কর্মচারী। ভারত সরকারের অধীনে core sector এ এমন অনেক সংস্থা আছে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের অকেজো সংস্থাগুলি বেশিরভাগই সেই পর্যায়ের নয়। শুধু আর্থিক বিপর্যয় থেকে তাদের বাঁচানো এবং বেকারের সংখ্যা যাতে না বাড়ে সেই কারণেই তাদের অধিগ্রহণ করতে হয়। এই সংস্থাগুলি সরাসরি বেচে দিতে পারলে প্রায় ৪০,০০০ একর নিষ্ফলা জমিতে অনেক লাভদায়ক প্রকল্প শু করা যায়, কর্মীদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা যায় এবং তহবিলেও কিছু জমা পড়ে। অথচ ট্রেড ইউনিয়ন কর্তারা এবং কিছু বামপন্থী শরিক রাজী নয়। তাঁদের আশঙ্কা যে ওই বিক্রীত সংস্থার টাকা যদি কোনও নিয়মে বাঁধা investment Fund -এ জমা না পড়ে তা হলে সরকার প্রশাসনের কাজেই খরচ করে ফেলবে। রাজারহাট উপনগরী কল্পে যেসব চাষীদের কাছ থেকে জমি কিনে নেওয়া হয়েছিল পুনর্বাসনের ও ক্ষতিপূরণের আশ্বাস দিয়ে, তাদের অনেকেই এখনও পর্যন্ত ন্যায্য টাকা বা সাহায্য পায়নি এমন অভিযোগ করেছেন তৃণমূল কংগ্রেসের নেত্রী মমতা ব্যনার্জী। এবারে ইন্দোনেশিয়ারর উপনগরী নির্মাণের প্রকল্পে আরও বিরাট সংখ্যকচাষী বাস্তুচ্যুত হবে এবং তখন এই ধরনের সমস্যাগুলি গুতর আকার ধারণ করবে এমন আশঙ্কা করেছেন অনেক বামশরিকদল বা অন্যান্য রাজনৈতিক দলনেতারা। সরকারী পক্ষের নেতারা এবং মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেববাবু ঘোষণা করেছেন যে চাষযোগ্য জমি বিরাট আকারেঅধিগ্রহণ করা হবে এমন আশঙ্কা করা অমূলক। বেশির ভাগই হবে নিষ্ফলা জমি। আর সেই চাষীদেরও ক্ষতিপূরণ বা অন্য জমি দেওয়া বা অন্য জীবিকার জন্য ট্রেনিং দেওয়া এইসব বিষয়গুলিকেই পরিকল্পনার অন্তর্গত করা হয়েছে। বিভিন্ন স্কেলে ওই অর্থ ও জমি বন্টনের পুরো 'প্যাকেজ' তৈরী করা হয়েছে। এ সবই স্বস্তির কথা। তবে

পরিকল্পনা রূপায়ণের সময় হিসেবনিকেশ ঠিকমতো হবে কি না সেটাই চিন্তার বিষয়। আর শ্রমিক পুনর্বাসনের জন্যও তো টাকার দরকার। সেটা আসবে কোথা থেকে? ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী নিপম সেন একটি বিবৃতি দিয়েছেন। তা থেকে জানা গেল কেন্দ্রীয় সরকার এই PUS ছাড়া আরও যুক্ত করা হয়েছে কিছু Power এবং Transport Sector - এর সংস্থা। এদের মধ্যে কিছু পরিচিত নাম পাওয়া গেলে যেমন ওয়েস্টবেঙ্গল ইলেকট্রিসিটি বোর্ড, দুর্গাপুর প্রজেকটস্ লিমিটেড, ক্যালকাটা গ্যাস সাপ্লাই করপোরেশান লিমিটেড, ওয়েস্টবেঙ্গল সারফেস ট্রান্সপোর্ট কোম্পানী লিমিটেড ইত্যাদি। কিছু Voluntary Retirement Scheme -এর সাথে সীমিত সময়ের জন্য মেডিল্যাল হেলথ ইনসিউরেন্স ব্যবস্থাও যোগ করা হয়েছে। PSU গুলি, বিশেষত লাভদায়ক PSU গুলি বিলগ্নীকরণের ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকার ও প্রাদেশিক সরকারের মধ্যে নীতিগতভাবে মতানৈক্য আছে। BHEL -এর মতো সংস্থার ৪০ শতাংশ শেয়ার বিক্রী করে দেবার জন্যেও সরকার এমন সময়ে মনস্থির করেছিল কিন্তু বামপন্থীদল ওই ধরনের সংস্থা থেকে ১০ শতাংশ শেয়ার বেচে দিতে ও রাজী নন। কেন্দ্র সরকারও হালে আশ্বাস দিয়েছেন এ শেয়ার বিক্রি করার কোন প্ল্যান আপাতত তাদের নেই। সেই একই ধরনের মতবিরোধ আছে বিভিন্ন দলের মধ্যে Print media -কে এবং ভোগ্যপণ্যের Retail ব্যবসাকে সকলের জন্য এমনকি বিদেশী পুঁজিপতিদের জন্যও ঝিায়নের জোয়ারে যখন খোলাবাজারের প্রতিযোগিতায় সবাইকে নামতেই হবে, তখন নীতিগতভাবে রক্ষণশীলতা বা স্থিতাবস্থা বজায় রাখলে ভবিষ্যতে আমরাই পেছিয়ে পড়ব এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ পাওয়া থেকে দেশের মানুষ বঞ্চিত হবে। অন্য দলের কাছে এটা অর্থনৈতিক স্বাধীনতা বজায় রাখার প্রশ্ন এবং উন্নত দেশগুলির কাছে আত্মসম্মান ও নিরাপত্তা হারানোর প্রশ্ন। সম্প্রতি ১৮তম কংগ্রেসের অধিবেশনের পর সিপিআই (এম)- এর রাজ্যসভার নেতা সীতারাম ইয়েচুরি একটি বিবৃতি দিয়েছেন (T.O.I. 15/8/2005) তার থেকে আংশিক উদ্ধৃতি দেওয়া হল ঃ

"It (globalization) seeks to erode, if not nullify the right of any sovereign country to impose any restrictions in the interests of protecting its domestic economy on the movement of such foreign capital… The flow of FDI into our country in the present circumstances must be regulated by stipulating three conditions:

ঢ. Such F.D.I. should augment the existing productive capacities in our country (i.e. not only to take over existing domestic industries.

ঢঢ. Must upgrade the Indian economy technologically

ঢঢঢ. Must lead to employment generation…It would be naïve to suggest, as some do that the imposition of such conditions will deter the flow of F.D.I. It must be kept in mind that just as the developing countries require F.D.I, so does the F.D.I. require avenues for employment for profit generation'.

এই বিবৃতি থেকে সি.পি.আই (এম) - এর বর্তমান আপোষী মনোভাব অনেকাংশেই প্রকাশ পাচ্ছে। তবে তাঁর বিবৃতির শেষ অংশের সঙ্গে সহমত হওয়া শক্ত। F.D.I. বা দেশের পুঁজিপতিরা অর্থবিনিয়োগের সময় তাদের নিজেদের স্বার্থই প্রথমে দেখবে অর্থাৎ কোন কোন শিল্পে কত কত সময়ে কত বেশি মুনাফা অসাবে। এই বিচারে সহায়ক হবে স্থানীয় পরিকাঠামো, জমি-জমার আইনকানুন, শ্রমনীতি, আয়করনীতি, শিক্ষিত বা কলাকৌশলে দক্ষ শ্রমিকদের সংখ্যা, এই ধরনের বিষয় এবং এর সঙ্গে জড়িত আছে পথঘাট, রেলওয়ে, এয়ারপোর্ট, জাহাজ - পোর্ট ইত্যাদির অনুকূল ব্যবস্থা। অনেক সময় তারা নিজেরাই এই সব service Sector এ বা Infrastructure তৈরী করবার জন্যও পুঁজি বিনিয়োগ করতে রাজী। কিন্তু সরকারী নীতি যদি অনুকূল না হয় বা আমলাতান্ত্রিক হস্তক্ষেপ বড় মাপের হয় তবে তারা অন্যত্র চলে যাবে – যেখানে প্রতিযোগী দেশ বা প্রদেশ তাদের স্বাগত জানাতে রাজী। আমাদের দেশেই টাটা কোম্পানী চলে গেল ঝাড়খণ্ডে, পৃথিবীখ্যাত মিত্তর কোম্পানী দেশের বৃহত্তম স্টীল প্ল্যান্ট পশ্চিমবঙ্গে না বানিয়ে ওড়িষাতে চলে গেল। কাজেই এসব ক্ষেত্রে নীতিগতভাবে flexible না থাকলে সময় ও সুযোগ হাত ছাড়া হয়ে যাবে।

এরপরে বুনিয়াদী প্রশ্নটি জড়িয়ে আছে পুঁজি নিবেশের সময় কোন ক্ষেত্রে এবং কেমন ধরনের শিল্প অগ্রাধিকার পাবে। অর্থাৎ পুঁজি - নির্ভর শিল্প বনাম শ্রমিক নির্ভর শিল্প (Capital Intensive Industry বনাম Labors Intensive Industry) । ভারত সরকারের Central Statistical Organization -এর একটি তথ্যে জানা যাচ্ছে পুঁজি বিনিয়োগের সঙ্গে সঙ্গে কর্মসংস্থান কতটা হচ্ছে। তুলনামূলকভাবে তিনটি সময় পর্বে যেমন ১৯৮০-৮১, ১৯৯০-৯১ এবং ১৯৯৮-৯৯ আর্থিক বৎসরে প্রতি এক লক্ষ টাকা বিনিয়োগের ফলে কর্মসংস্থান হয়েছে যথাক্রমে ২.২৮ জন, ১.৫৯ জন এবং ০.৪৯ জন, অর্থাৎ বিনিয়োগের ফলে ক্রমশ কর্মসংস্থান হচ্ছে কম সংখ্যক লোকের। একজন সাংবাদিক এই তথ্যের ওপর ভিত্তি করে দেখিয়েছেন যে হলদিয়াতে ১২ মেগাওয়াটের একটি ছোট বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্পে ৩৬ কোটি টাকা বিনিয়োগ করতে হবে অথচ কর্মসংস্থান হবে মাত্র ১৮ জনের। এই প্রশ্নের সঙ্গেই জড়িয়ে আছে শহর বনাম গ্রামাঞ্চলে পুঁজি বিনিয়োগের প্রশ্ন। সর্বভারতীয়স্তরে দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাসকারীদের অনুপাত (১৯৯৯-২০০০) এই রকম ঃ শহরে প্রায় ২৩.৬২ শতাংশ আর গ্রামাঞ্চলে প্রায় ২৭.৯ শতাংশ। পশ্চিমবঙ্গে তুলনীয় অনুপাত হচ্ছে শহরাঞ্চলে ১৪.৮৬ শতাংশ এবং গ্রামাঞ্চলে ৩১.৮৫ শতাংশ। শোনা যায় কলকাতা শহরের বস্তিতেই নাকি শহরের ৩০ শতাংশ লোক কাজ করে। কাজেই অনেকে এই প্রশ্ন তুলে থাকে যে শহরে পথঘাট, সেতু, উড়ালপুল, বিশালকায় আবাসন, শপিং কাম কমার্শিয়াল কমপ্লেক্স ইত্যাদি ইত্যাদি সবই জন নয়নলোভন উন্নয়নের সাক্ষ্যবহন করে কিন্তু তার কতটুকু প্রভাব গ্রামাঞ্চলে চুয়ে চুয়ে পড়বে? পরিষেবা সেক্টরের উন্নতির জন্য, তার পর্যাপ্ত চাহিদা তৈরী করবার জন্য শিল্প দরকার। শিল্প দ্রব্য তৈরী হলে তবেই তো বাণিজ্য হবে, বিপণন হবে। এটা একটা বুনিয়াদী প্রশ্ন যার সঙ্গে অন্য পুঁজি নিয়োগে অগ্রাধিকারের প্রশ্ন জনিয়ে আছে।

নিবেদনের শেষে প্রশ্নের ভিড় বাড়িয়ে দেওয়াটা সমীচীন হবে না। পশ্চিমবঙ্গ ক্রমশ অবক্ষয়ের বলয় থেকে বেরিয়ে আসছে এইটেই স্বস্তির বিষয়। তবে কিছু আশঙ্কার কথা ব্যক্ত করা দরকার। পরিকল্পনা এক জিনিস আর তার রূপায়ণ অন্য। এব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গের তেমন সুনাম নেই। এশীয় ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক পশ্চিমবঙ্গে সরকারের উন্নয়ন প্রকল্পে আট বছরের মেয়াদ ১৫১৮ কোটি টাকার অনুদান দেবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। প্রস্তুতি পর্বেই কেটে গেছে প্রথম তিন বছর। ২০০২-২০০৩ সালের আর্থিক বছরে কাজ শু করবার পর খরচ হয়েছে মাত্র ৬৫ কোটি টাকা। দেশের প্রধান মন্ত্রীর রোজগার যোজনা কার্যকর করার ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গের রেকর্ড বিহারের থেকে খারাপ। নীচে তথ্য দেওয়া হল (২০০৪-২০০৫) ঃ

বিভিন্ন ব্যাঙ্কের প্রকল্পের জন্য আবেদন ব্যাঙ্কের অনুমোদন টাকা হাতে
বিহার - ১০,৯৬৩ ৬৫.৩৫ ৪৫১০
পশ্চিমবঙ্গ ৭,০৪২ ৩১০১ ২০১৩

কাজেই বঙ্গভূমির বাসিন্দাদের পরিকল্পনা রূপায়ণের ব্যাপারে অবশ্যই আরও তৎপর হতে হবে। জনসাধারণকে তাদের প্রাপ্য অধিকার সম্বন্ধে জাগ্রত করতে হবে এবং জনপ্রতিনিধিদের বা ভারপ্রাপ্ত কর্মীদের public accountability আরও বাড়াতে হবে। তবেই পশ্চিমবঙ্গ সব দিক থেকে জেগে উঠবে।

সৃষ্টিসন্ধান
Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com